দৈনিক জনকণ্ঠ

97

তারিখ ... 23 JUL 1997 ...
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ১ ...

ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে শিক্ষা

বাংলাদেশের মতো একটি দরিদ্র দেশের জন্য শিক্ষা কতখানি গুরুত্বপূর্ণ তা ব্যাখ্যা করে বলার অপেক্ষা রাখে না। এ দেশ পিছিয়ে আছে যুগ যুগ ধরে। আজকের দুনিয়ার বিচারে পিছিয়ে আছে অর্থনীতি ক্ষেত্রে, পিছিয়ে আছে উন্নয়নের ক্ষেত্রে, পিছিয়ে আছে শিক্ষা বিস্তারের ক্ষত্রে। যুগ যুগের পর্যায়ক্রমিক এবং ধারাবাহিক ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণ-লুণ্ঠনের ফলে এ দেশের অর্থনীতি ঝাঁঝরা হয়ে গেছে। উন্নয়নও তেমন হয়নি। কেবল বিদেশী লুণ্ঠনকারীদের শাসন-শোষণের প্রয়োজনে যেটুকু হওয়া দরকার সেটুকু ছাড়া। আর শিক্ষার ব্যাপারে জ্বলন্ত সত্য হচ্ছে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকদের শাসন-শোষণকে পাকাপোক্ত ও ফলপ্রসূ করার কাজে সাহায্য করার জন্য কেরানি সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই ব্রিটিশ সূচিত শিক্ষা ব্যবস্থা ও পদ্ধতির সূত্রপাত হয়েছিল। পরবর্তীকালে পাকিস্তানী ঔপনিবেশিক শাসনামলে সেই ধারার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল একটি চক্রান্ত। এ দেশবাসীর মাতৃভাষাকে পাকে প্রকারে নির্বাসন দেয়ার চক্রান্ত। যে কোন জাতির শিক্ষার তথা জ্ঞানের প্রধান এবং প্রাথমিক ভিত্তি হচ্ছে তার মাতৃভাষা। ব্রিটিশরা তা যে কাজটি প্রায় আড়াই শ বছরে করেনি, পাকিস্তানী শাসক চক্র পাকিস্তান সৃষ্টির প্রায় পর মুহূর্ত থেকেই সেই চক্রান্ত শুরু করে। এই ঘটনাটি বাঙালী জাতির ইতিহাসে বড় একটি অধ্যায়। এটি ছাড়াও পাকিস্তানী আমলে এ দেশে শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে তেমন উল্লেখযোগ্য কিছুই হয়নি।

এসব শাসন-শোষণ, বিদেশীদের লুণ্ঠন এবং সেসব কারণে অনুন্নয়ন এবং পিছিয়ে থাকা। এগুলো দূর করে প্রকৃত স্বাধীনভাবে বাঁচা এবং উন্নয়নের পথে দুনিয়ার আর পাঁচটা জাতির সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দৃপ্তপদে এগিয়ে চলার স্বপ্নগুলোই স্বাধীনতার স্বপ্নে রূপান্তরিত হয় এক সময়। তারপর বহু আকাঙ্ক্ষিত, বহু-প্রার্থিত স্বাধীনতা আসে। সঙ্গে সঙ্গে খুলে যায় প্রকৃত উন্নয়নের, প্রকৃত শিক্ষার, দেশ গড়ার, উন্নত-শিক্ষিত-সমৃদ্ধ জাতি হিসাবে বিশ্বে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার সম্ভাবনার স্বর্ণদ্বার। দেশের উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন শিক্ষিত জাতি। কোন দেশ ব্যাপক অশিক্ষা, কুসংস্কার, অপশিক্ষা, কুশিক্ষা ইত্যাদি বজায় রেখে উন্নয়নের স্বর্ণশিখরে পৌঁছতে পেরেছে এমন দৃষ্টান্ত নেই। আজকের যুগে শিক্ষা ছাড়া, আধুনিক বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষা ছাড়া দেশের উন্নয়ন অসম্ভব। স্বাধীনতার পর থেকে অতিক্রান্ত ছাব্বিশ বছরে দেশে শিক্ষিতের হার হয়ত গোনার হিসাবে বেড়েছে, স্কুল-কলেজ হয়ত অনেক স্থাপিত হয়েছে। কিন্তু এত বছরে সাক্ষরতার যে লক্ষ্য অর্জিত হওয়া উচিত ছিল তা হয়নি, এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায়। আজও বিপুলসংখ্যক মানুষ অক্ষর জ্ঞানহীন। আজও অগণিত শিশু বিদ্যালয়ে যায় না। আজও প্রতিনিয়ত যেসব শিশু জন্মগ্রহণ করছে তাদের কতজনের ভাগ্যে স্কুল কক্ষ দর্শন সম্ভব হবে তাও বলা মুশকিল। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর শিক্ষার ওপর, নিরক্ষরতা দূরীকরণ বিষয়ে বিভিন্ন সময়ে গুরুত্ব আরোপ করেছে। এ ব্যাপারে বেশ কিছু উদ্যোগ নেয়া হয়েছে এবং নেয়া হবে বলে জানা গেছে।

নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য প্রয়োজন আরও বিদ্যালয়। চাই শিক্ষার উপকরণ, শিক্ষা সহায়ক সরঞ্জামাদি। সেই সঙ্গে প্রয়োজন পর্যাপ্ত সংখ্যক দক্ষ শিক্ষকের। অতীত থেকে শিক্ষার ক্ষেত্রে যথাযথ নিয়মনীতির অভাবের কারণে নানা অনিয়ম এই ক্ষেত্রটিতে ঢুকে গেছে। সে সবের একটি হচ্ছে ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালু করা। সরকারী প্রচেষ্টার পাশাপাশি বেসরকারী উদ্যোগও শিক্ষা বিস্তারে সহায়ক– সন্দেহ নেই। এ দেশে বেসরকারী উদ্যোগে বিভিন্ন সময়ে বহু বিদ্যালয়-কলেজ ইত্যাদি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সেগুলো আজও দেশে শিক্ষা বিস্তারে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে। কিন্তু এরই পাশাপাশি একটি বিপরীত বাস্তবতা হচ্ছে, কেবল লাভজনক ব্যবসা হিসাবেও এ দেশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়া ও তা চালু করার ঘটনা বিভিন্ন সময়ে ঘটেছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যাল্পতা, বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিশেষ করে নাম করা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোয় ভর্তি হওয়ার জন্য ছাত্রদের ভিড়– এসব কারণ ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার বিষয়টিকে উৎসাহিত করেছে। এ ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষা বিস্তারে ভূমিকা রাখে বলা হলেও, এগুলো মূলত পরিচালিত হয় ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়, শুধু প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয় কিছু কিছু প্রতিষ্ঠানই নয়, কিছুদিন আগে জানা গিয়েছিল একাধিক ভুয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের কথাও। যেগুলো ছিল প্রয়োজনীয় শিক্ষার সুবিধাবিহীন স্রেফ ব্যবসার উদ্দেশ্যে গঠিত প্রতিষ্ঠান। পরবর্তী সময়ে অবশ্য এ ব্যাপারে যথাযথ নীতি প্রণয়ন করা হয়। অতিসম্প্রতি আরেকটি প্রয়োজনীয় নীতিমালা শিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রণয়ন করেছে। এই নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে শুধুমাত্র ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে বা নামের জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠাকে নিরুৎসাহিত করার জন্য। এ নীতিমালার আওতায় শিক্ষা বিস্তারের মূল লক্ষ্যে যাঁরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার কাজে এগিয়ে আসবেন, উপকৃত হবেন তাঁরাই। বেসরকারী উদ্যোগে স্কুল-কলেজ- মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে প্রচলিত নীতিমালা স্বচ্ছ ও যুগোপযোগী করাও এই নীতিমালার উদ্দেশ্য। জানা গেছে, এ নীতিমালা অনুযায়ী বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে স্থায়ী স্বীকৃতি পেতে এখন অতিক্রম করতে হবে চারটি ধাপ। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত আবেদন গ্রহণের পর যথাক্রমে তিন, পাঁচ ও সাত বছরের অস্থায়ী স্বীকৃতি দেয়া হবে। এসব ধাপ পেরোনোর পর আসবে স্থায়ী স্বীকৃতি।

প্রকাশিত তথ্যে জানা গেছে, প্রাথমিক অনুমতি ছাড়া স্কুল- কলেজ বা মাদ্রাসা চালু করা যাবে না। আবেদন করার পর তিন মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কাগজপত্র, পরীক্ষা ও স্থান পরিদর্শন করে প্রাথমিক পর্যায়ে অনুমতি দেয়া হবে তিন বছরের জন্য। এ মেয়াদ শেষে পাবলিক একজামিনেশন ও বৃত্তি পরীক্ষার ফলাফল, শিক্ষার্থীর সংখ্যা ও তাদের উপস্থিতি ইত্যাদি বিবেচনার পর দ্বিতীয় পর্যায়ে পাঁচ বছরের স্বীকৃতি দেয়া হবে। এরই মধ্যে নিতে হবে শিক্ষকদের পেশাগত প্রশিক্ষণ। যাবতীয় শর্ত পূরণ সাপেক্ষে দশ বছর মেয়াদী ও সবশেষে স্থায়ী স্বীকৃতি দেয়া হবে। নতুন নীতিমালায় ব্যক্তির নামে বিভিন্ন পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনে নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা প্রদানের এবং চার পর্যায়ের স্বীকৃতির জন্য বিভিন্ন পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য রেজিস্ট্রেশন ফী নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে। ন্যূনতম কি পরিমাণ জনসংখ্যা থাকলে কোন এলাকার কোন্ পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার অনুমতি মিলবে নীতিমালায় তাও নির্দিষ্ট করা হয়েছে। দেশে বেসরকারী পর্যায়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা শিক্ষা বিস্তারের জন্য জরুরী। কিন্তু প্রকৃত শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্য নিয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়া আর শুধুমাত্র ব্যবসার জন্য গড়া দু'টি ভিন্ন উদ্দেশ্যের ব্যাপার। নতুন নীতিমালা শেষোক্ত এই প্রবণতাকে রোধ করতে সমর্থ হবে বলে আমাদের বিশ্বাস। আর সেটা করতে পারলেই এই নীতিমালা প্রণয়ন সার্থক হবে।